X ফাইল যদি লাইগা যায়

১২ পর্ব

অনিয়মের নতুন ধারা

ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের ১১টি পর্ব থেকে আয় হয়েছে কমপক্ষে ২২ কোটি টাকা। যা দেশের ক্রীড়ার উন্নয়নে কোন কাজে আসেনি। তহবিল হয়েছে লোপাট। আয়-ব্যয়ের হিসেব নেই ক্রীড়া পরিষদের কাছে। এবার সরকার লটারীর মূল লাভ তুলে দিয়েছে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে। লটারীর আগেই একটি শ্রেণীর ভাগ্য খুলে গেছে... রিপোর্ট **বদরুল আলম নাবিল**

লটারির টিকিট একজন মানুষ কেনে মূলতঃ একটি কারণে। 'যদি লাইগা যায়' এই চিন্তাতেই থাকেন সবাই। না লাগলে মনকে সান্ত্বনা দেন টাকাটা কাজে লাগবে দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে। একটা মহৎ কাজ করা হলো এই ভাবনা সান্ত্বনা হিসেবে থাকে। কিন্তু ঐ মানুষগুলো কখনো জানতে পারে না মহৎ উদ্দেশ্যে খরচ করা তার টাকা কিভাবে কোথায় খরচ হচ্ছে, কারা লুটপাট করে ধনবান হচ্ছে?

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ১৯৯৩ সাল থেকে ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল গঠনের জন্য এ পর্যন্ত

- ৫ কোটি টাকার টিকেট বিক্রি হয়েছে ৮০ লাখ টাকায়!
- ১১ পর্বের আয় ২২ কোটি টাকার হিসাব নেই

১১টি পর্বের লটারি সম্পন্ন করেছে। ১২তম পর্বের লটারি কার্যক্রম চলছে। পূর্বে ১১টি পর্ব থেকে ২২ কোটির বেশি অর্থ আয় হয়েছে।

কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায়, কিভাবে খরচ করা হল তা কখনো জনসাধারণকে জানানো হয়নি। যেহেতু জনগণ কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে টিকেট কিনে জনকল্যাণের জন্য তহবিল গড়ে তুলছে, সে কারণে সে অর্থ কিভাবে খরচ হচ্ছে তা জানার

নৈতিক অধিকার তাদের আছে।

জনগণকে জানানো দূরের কথা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্তা ব্যক্তিরাও কেউ জানে না এই অর্থ কিভাবে খরচ করা হয়েছে।

রিপোর্টের প্রয়োজনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব আব্দুল কুদ্দুস, ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (অর্থ) সরোয়ার ভূঁইয়া, পরিচালক (ক্রীড়া) ড. আব্দুস সবুর, পরিচালক প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত সচিব) মেজর (অবঃ) এনামুল হক খান ছাড়াও ক্রীড়া পরিষদের সাধারণ শাখা, হিসাব শাখা এবং বাজেট শাখায় যোগাযোগ করা হয়। মেজর (অবঃ) এনামুল হক খান বলেছেন কোথায় কত খরচ হয়েছে তার হিসাব আছে তিনি সে হিসাব দেখানোর তারিখ দিয়েও দেখাতে পারেননি। অন্য সকলে বলেছেন, 'সে হিসাব আমাদের কাছে নেই। অধিকাংশই বলেছেন আমরা নতুন এসেছি, আমি নতুন এসেছি সে হিসাবে কোথায় কিভাবে আছে আমার জানা নেই, হিসাব ঠিকমতো মেনটেইন করা হয়নি...' ইত্যাদি।

১১টি পর্ব থেকে লব্ধ অর্থ কোথায় খরচ হয়েছে তা জানা দূরে থাক, মোট কত টাকা ১১ পর্বে আয় হয়েছে তার সঠিক হিসাবও ক্রীড়া পরিষদের কাছে নেই।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লিখিত বক্তব্যে জানান, ১১টি পর্ব থেকে মোট ২১ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এ তথ্য সত্য নয়। কারণ আমরা যে ৯টি পর্বের হিসেব উদ্ধার করতে পেরেছি তাতে মোট আয় হয়েছে ১৯ কোটি ১৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। তবে কী বাকি দুটি পর্ব থেকে মাত্র ১ কোটি ৮২ লাখ ১৫ হাজার টাকা আয় হয়েছে!

উল্লেখ্য, এই তথ্যটি প্রতিমন্ত্রীকে সরবরাহ করেছিল ক্রীড়া পরিষদ। কিন্তু সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে যখন জানতে চাওয়া হয় কোন পর্বে কত আয় হয়েছে? শুধুমাত্র সর্বশেষ ১০ম এবং ১১তম পর্বের আয় ছাড়া আর অন্য পর্বগুলোর আয় তারা দেখাতে পারেনি। কিন্তু আমরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন বছরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রথম থেকে ৭ম পর্ব পর্যন্ত আয়ের হিসাব উদ্ধার করতে পেরেছি। ৮ম এবং ৯ম পর্বের আয়ের হিসাব উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

'আমরা তদন্ত করে অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। তবে ভূত দিয়ে তো ভূত ছাড়ানো যাবে না'

ফজলুর রহমান পটল

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী

'অতীতের দুর্নীতি নিয়ে মাথা খাটিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনি। মনোযোগ দিয়েছি খেলাধুলার দিকে'

ওবায়দুল কাদের

সাবেক প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফুটপাথ এবং রাজপথ দখল করে লটারীর টিকেট বিক্রি হচ্ছে

প্রতিভা অন্বেষণের নামে লোপাট

ক্রীড়া পরিষদে কোনো রকম হিসাব না পেয়ে সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের কাছে জানতে চাওয়া হয় লটারি থেকে লব্ধ ২২ কোটি টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তিনি জানেন কি না। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এই অর্থ প্রতিভা অন্বেষণ এবং প্রশিক্ষণে ব্যবহার হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট যেমন সাফ গেমস, এশিয়ান গেমস ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণে খরচ করা হয়েছে।

ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (ক্রীড়া) ড. আব্দুস সবুর বলেছেন, 'ফুটবল, হকি, ভলিবল, শুটিং, কাবাডি, ক্রিকেট, খো খো, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার প্রভৃতি খেলায় প্রতিভা অন্বেষণে খরচ হয়েছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় এই প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচিতে গত এক দশকে এসব খেলার জন্য কয়টা প্রতিভা পাওয়া গেছে। সে হিসাব ক্রীড়া পরিষদ দিতে পারবে না। কারণ, এ কর্মসূচি যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হতো তবে দিন দিন ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভার অভাব এতো প্রকট হয়ে উঠত না, দেশীয় খেলার মানও ক্রমশ পড়ে যেত না।'

আসলে এসব অর্থ সাইনবোর্ড সর্বস্ব ৩৪টি ক্রীড়া ফেডারেশনের মধ্যে প্রতিবছর ভাগ করে দেয়া হয়েছে। ফেডারেশনগুলোর কর্মকর্তারা লোক দেখানো একটি কর্মসূচি দিয়ে বাকি অর্থ হজম করে ফেলেছেন।

বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশে ২২ কোটি টাকার তহবিল কম নয়। কিন্তু

তহবিলের যদি কোনো আউটপুট না থাকে তবে দরিদ্র জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এই তহবিল গঠন করে কিছু লোককে ধনী হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার অর্থ কী?

ক্রীড়া পরিষদের ১২টি পর্বের মধ্যে ১০টির সঙ্গে লটারি প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাড কিং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমরুল চৌধুরী। প্রথম ৯টি পর্বের প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছিল অ্যাড কিং এবং বর্তমান ১২তম পর্বের পুরো প্যাকেজ কিনে নিয়েছে অ্যাড কিং। এমরুল চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাদের টাকা দেখে লোভ এসে গেছে তাই তারা লটারির আয়োজন করছে। কিন্তু এই তহবিলের টাকা কোথায় খরচ করা হয় তা জানার অধিকার জনগণের আছে।'

'ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাদের টাকা দেখে লোভ এসে গেছে তাই তারা লটারির আয়োজন করছে'

ইমরুল চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
অ্যাডকিং

মাইকে উচ্চস্বরে গান বাজিয়ে লটারীর টিকেট বিক্রি হচ্ছে যা মারাত্মক শব্দ দূষণ করছে

৫ কোটি টাকার টিকিট ৮০ লাখ টাকায় বিক্রি

ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের বিগত ১১টি পর্বের সবগুলো আয়োজন করেছিল ক্রীড়া পরিষদ নিজে। শুধুমাত্র প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে। কিন্তু চলতি পর্বটি পুরো প্যাকেজ ৮০ লাখ টাকায় বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাড কিং-এর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। অ্যাড কিংকে ১০ টাকা মূল্যমানের ৫০ লাখ টাকার লটারি টিকেট ছাপার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যার মোট মূল্য ৫ কোটি টাকা। বিগত ১১টি পর্বের যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, প্রতিটি পর্বে গড়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২ কোটি টাকার মতো আয় হয়েছে। ৫ম পর্বে সব ধরনের খরচ বাদে ক্রীড়া পরিষদের আয় হয়েছিল ৪ কোটি ৩০ লাখ ৩২ হাজার টাকা। সবচেয়ে কম আয় হয়েছিল ২য় পর্বে, ১ কোটি ৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা। ১০ম পর্বে সর্বমোট বিক্রি হয়েছিল ৪ কোটি ৭১ লাখ ৫৯ হাজার ১৯০ টাকার টিকিট। পরিচালনা ও পুরস্কার বাবদ ব্যয় হয়েছিল ২ কোটি ৪৪ লাখ ৯৯ হাজার ৫৬৩ টাকা। নিট আয় হয়েছিল ২ কোটি ২৬ লাখ ৫৯ হাজার ৬২৭ টাকা।

১১তম পর্বে মোট বিক্রি হয়েছিল ৩ কোটি ২০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। পরিচালনা ও পুরস্কারে ব্যয় হয়েছিল ২ কোটি ৭ লাখ ১৯ হাজার ২১০ টাকা। নিট আয় হয়েছিল ১ কোটি ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ৭৯০ টাকা।

ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়সারা কর্মসূচি এবং অপচয়ের পরেও প্রতিটি পর্বে গড়ে ২ কোটির বেশি লাভ হয়েছে। কিন্তু সে প্যাকেজ কেন মাত্র ৮০ লাখ টাকায় একটি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেয়া হল? ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল বলেন, 'সময় কম, অল্প সময়ে ক্রীড়া পরিষদ এটা অর্গানাইজ করতে পারত না বলে এটা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে কেউ বেশি দর দিতে চায়নি। সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে অ্যাড কিং কাজটি পেয়েছে।' ক্রীড়া পরিষদের পরিচালকদের একই প্রশ্ন করা হয়। তারা উত্তরে বললেন, ঝামেলা এড়ানোর জন্য এটা করা হয়েছে।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, লটারির উদ্দেশ্য যদি হয় তহবিল সংগ্রহ সেক্ষেত্রে যেভাবে বেশি আয় হবে সেটাই অনুসরণ করার কথা। ঝামেলা নিতে না পারলে লটারির আয়োজন কেন? আর চাকরি করার নাম যে শুধু আরাম আয়েশ নয় তাও তাদের বোঝা উচিৎ। এছাড়া প্রশ্ন ওঠে অন্যান্য বিষয়েও। কেননা অ্যাড কিং-এর মতো একটি ছোট বিজ্ঞাপনী সংস্থা যদি কম সময়ে এটি লাভজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারে তবে প্রশাসনিক সহায়তা এবং বিপুল লোকবল নিয়ে ক্রীড়া পরিষদ অতীতে পারলে এখন কেন পারবে না। উল্লেখ্য, প্রতিটি জেলায় জেলায় ক্রীড়া পরিষদের একটি পূর্ণাঙ্গ অফিস আছে সেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি করে বহরও আছে। যারা সারা বছর প্রায় কোনো কাজ না করেই বেতন নিচ্ছেন।

অ্যাড কিং যদি পুরো ৫০ লাখ টিকিট বিক্রি করতে পারে তবে তাদের নিট লাভ হবে কমপক্ষে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। ৪০ লাখ টিকিট বিক্রি হলে লাভ হবে কম করে হলেও ৬৫ থেকে ৭০ লাখ টাকা। ৫০/৬০ লাখ টাকা অগ্রিম খাটিয়ে এই লাভ বিশাল লাভ। অ্যাড কিং এ পর্যন্ত ক্রীড়া পরিষদকে ৪০ লাখ টাকা দিয়েছে। টিকিট প্রিন্টিং খরচ ৮ লাখ টাকা, প্রচার খরচ ২৫ লাখ, ৪০ শতাংশ হারে টিকিট সেলারদের দিতে হবে দেড় থেকে ২ কোটি টাকা। বাদ বাকি পূরো টাকাটার মালিক অ্যাড কিং।

লটারির ইতিবাচক উদাহরণ

বাংলাদেশে ডায়াবেটিক চিকিৎসার পথিকৃৎ ডা. ইব্রাহিম আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডায়াবেটিক হাসপাতাল (বারডেম) গড়ে তুলেছেন। এই হাসপাতালটি বড় হয়ে ওঠার পেছনে লটারির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কয়েকবার লটারি করে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনেছেন।

মিরপুরে গড়ে উঠেছে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল। এখানে হার্টের রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। হার্ট ফাউন্ডেশনও ৫টি পর্বের লটারি করে তহবিল সংগ্রহ করে এই হাসপাতালটি তিলে তিলে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কয়েকবার লটারি করে আর্ত মানবতার সেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে। শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এবং সন্ধানী লটারি থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা মানবতার সেবা করছে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সর্বাধিকবার এবং অন্যেরা সকলে মিলে লটারি থেকে যা আয় করেছে তার চেয়ে বেশি আয় করে তা কাজে লাগাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

অদৃশ কারণে তদন্ত স্থগিত

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ক্রীড়া পরিষদ এবং অ্যাড কিং থেকে আগের ৯টি পর্বের কাগজপত্র সিজ করে নিয়ে গিয়েছিল। দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা করার জন্য তদন্ত শুরু করেছিল। কিন্তু তদন্তের ফলাফল মানুষ আর জানতে পারেনি। মামলা হলেও সরকার আর তা পরিচালনা করেনি। অবশ্য গত সরকারের সময় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ক্রীড়া পরিষদের ২ কর্মকর্তার চাকরি গিয়েছিল। অ্যাকাউন্টেট গোলাম মোস্তফা ১৫ লাখ টাকা এবং লটারি সেলের মোজাম্মেল ৭ লাখ টাকার আত্মসাতের অভিযোগে চাকরিচ্যুত হন।

এই দুই চুনোপুঁটির চাকরি খাওয়া হলেও কমিশন নিয়ে যেসব রাঘব বোয়ালরা ফেডারেশনগুলোকে লুটপাট করার সুযোগ দিয়েছেন তাদের কিছুই হয়নি।

এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'অতীতের দুর্নীতি নিয়ে মাথা খাটিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনি। আমি মনোযোগ দিয়েছি খেলাধুলার দিকে, তার রেজাল্টও পেয়েছি।' বর্তমান ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল এ সম্পর্কে বলেন, 'আমি এসব বিষয়ে হাত দেয়ার সময় এখনো পাইনি। তবে আমরা তদন্ত করে অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। তবে ভূত দিয়ে তো ভূত ছাড়ানো যাবে না।'

ক্রীড়া পরিষদের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় অর্থ আত্মসাৎ এবং অনিয়ম ধামাচাপা দেয়ার জন্য একাধিক বার রেকর্ডের কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এ কারণেই ক্রীড়া পরিষদ এখন হিসাব জানাতে পারছে না। এমনকি সংসদেও দায়সার তথ্য দেয়া হয়েছে।

ক্রীড়া তহবিলের লটারির আয়

পর্ব	নিট আয়
১ম	১ কোটি ৩৩ লাখ ৫২ হাজার
২য়	১ কোটি ৭ লাখ ৫২ হাজার
৩য়	২ কোটি ৩৯ লাখ ৫২ হাজার
৪র্থ	২ কোটি ৮৯ লাখ ৮৬ হাজার
৫ম	৪ কোটি ৩০ লাখ ৪২ হাজার
৬ষ্ঠ	১ কোটি ৯৬ লাখ ৮৫ হাজার
৭ম	১ কোটি ৮০ লাখ
১০ম	২ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার
১১তম	১ কোটি ১৩ লাখ ৫৬ হাজার
সর্বমোট	**২২ কোটি (কমপক্ষে)**

বাংলাদেশে লটারি

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম লটারির সূচনা হয় ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরে। তখন ডায়াবেটিক সমিতি, শিশু হাসপাতালের তহবিল সংগ্রহের জন্য তৎকালীন সরকার লটারির টিকিট বিক্রির অনুমোদন দেয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি পর্যায়ক্রমে লটারি করার অনুমতি পায়। কিন্তু ১৯৯৩ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রথম লটারি করে। চটকদার বিজ্ঞাপন 'যদি লাইগা যায়'-এর কল্যাণে ব্যাপক সাড়া জাগায়। প্রথম পর্বে আশাতীত সাফল্যের পরে ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাদের লোভ বেড়ে যায়। মাত্র ৩ বছরের মধ্যে তারা ৯ বার লটারির আয়োজন করে। যাতে তাদের আয় হয় প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি টাকা।

বিগত সরকারের সময়েও ক্রীড়া পরিষদ দুটি পর্বের লটারি করে। তাতে ৩ কোটি টাকার বেশি আয় হয়। কিন্তু এই তহবিল কিভাবে খরচ হয়েছে তা ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া পরিষদ কেউ জানে না।

'লাইগা' গেছে

ক্রীড়া প্ররিষদ এই লটারীর আয়োজনের নেপথ্যে সব সময়ই প্রচার করছে ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে তাদের 'মহৎ' চেষ্টার কথা। সেই চেষ্টার ফলাফল যে এখন পর্যন্ত অশ্ব ডিম্ব তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি ভবিষ্যতে যে এর তেমন উন্নতি হবে তারও কোনো দিক নির্দেশনা নেই। তবে 'ঝামেলা' এড়ানোর অজুহাতে নতুন সরকারের এবারের পদক্ষেপে কপাল খুলেছে অ্যাড কিং-এর লটারিতে যারই কপাল খুলুক সরকারের এমন অদ্ভুত চুক্তিতে ভাগ্য খুলেছে অ্যাড কিং এর।

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**